বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশুর শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ : অতীত ও ভবিষ্যৎ

ড. কুতুবউদ্দিন হালদার

ভারত সরকার ২০০৯ সালে ২৬ আগষ্ট দ্য গেজেট অব্ ইন্ডিয়াতে শিক্ষা বিষয়ক একটি আইন প্রকাশ করেন। আইনটির শিরোনাম হল 'The right of Children to Free and Cmpulsory Education Act, 2009'. এটি বাংলায় অনুবাদ হতে পারে 'বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশুর শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯'-এভাবে। আইনটি ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত 21A এবং মৌলিক কর্তব্য 51A(k) ধারা অনুযায়ী রচিত। আবার এই ধারা দুটি ২০০২ সালের ৮৬তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে। সেইজন্য আইনটির বিষয়বস্তু এবং ভবিষ্যতে এর উপযোগিতা আলোচনার পূর্বে প্রেক্ষাপটটি আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে। অতীতের ঘটনাবলীসমূহ পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথম পর্যায় : ১৯৪৭-এর পূর্ববর্তী সময়কালে ধারণা গঠন

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের থেকে গণপরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রায় চার দশক পূর্বে ১৯১০ সালে মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে তৎকালীন বম্বে প্রেসিডেন্সির ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবটি ছিল—যেসব এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের এক তৃতীয়াংশ শিশু পড়াশোনা করছে সেইসব এলাকায় প্রথমে এবং ধীরে ধীরে সব এলাকায় শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করা হবে। অবশ্য গোখলের পূর্বে ১৮৯৩ সালে গুজরাটের বরোদাতে দেশীয় রাজার রাজ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বাংলায়, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে ১৯১১ সালে বেঙ্গল প্রাইমারী এডুকেশন অ্যাক্টের যে বিষয়বস্তু ছিল তার মধ্যে বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক উপস্থিতি এবং অভিভাবকেরা যাতে তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে হাজির করেন তার উল্লেখ আছে। এছাড়া বিভিন্ন দেশীয় রাজার রাজ্যে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন ছিল। এমন কি মধ্যযুগে ও প্রাচীন

Scanned with CamScanner

ভারতে বিশেষত ঋক বৈদিক যুগের প্রথমদিকে সকলের জন্য শিক্ষা, শিক্ষায় সমসুযোগের ধারণা ছিল। মধ্যযুগে মুসলমান শাসকরাও অনেকেই শিক্ষানুরাগী ছিলেন। দার্শনিক আদর্শ হিসেবে ইসলামেও প্রত্যেক নরনারীর শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা হজরত মহম্মদ নিজেই বলেছিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৪৭ থেকে ১৯৯০ সালে ধারণার প্রসার

১৯৪৯ সালে সংবিধান গ্রহণ করার সময় সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশনাত্মক নীতির ৪৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল যে, সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পরবর্তী ১০ বছর সময়সীমার মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুর শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হবে। ৪৬ নম্বর ধারায় তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য দুর্বলতর সম্প্রদায়ের শিক্ষা বিষয়ক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উন্নতির বিধান ছিল। কিন্তু শিক্ষা যে সর্বজনীন হয়নি তা ১৯৬৬ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন তাদের 'শিক্ষা এবং জাতির উন্নয়ন' (Education and National Development) শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন। কমিশন সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় নন-এনরোলমেন্ট, অনুত্তীর্ণতা, ড্রপ-আউট ইত্যাদি সমস্যাগুলি উল্লেখ করেছেন। আর এই সমস্যার কারণসমূহ তিনটি বিভাগ শ্রেণীভুক্ত করেছেন, যথা-অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত। আর এইগুলির থেকে পরিত্রাণের জন্য শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠক্রম ও পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং শিক্ষায় অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার সুপারিশ করেছিলেন। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬৮ সালে প্রথম জাতীয় শিক্ষার নীতি গ্রহণ করা হয়। এখানে কমন স্কুল এবং শিক্ষায় সমতা স্থাপনে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ধর্ম, জাতি, লিঙ্গভেদে সকলেই রাষ্ট্রপোষিত বা রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ পাবে। কমিশন (১৯৬৪-৬৬) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষের মধ্যে ৬-১১ বছরে বয়সের এবং ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষের মধ্যে ১১-১৪ বছর বয়সের সকল শিশুর শিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণের সুপারিশ করেছিল। সময়টা দীর্ঘায়িত হওয়ায় (সাজেন্ট পরিকল্পনার উদাহরণ টেনে) অনেকেই সুপারিশটি সমালোচনা করেছিল। স্যার জন সাজেন্ট (১৯৪৪) সকলের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৪০ বছর সময় অর্থাৎ ১৯৮৫ সালের মধ্যে সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের জন্য তৎকালীন রাষ্ট্রনেতারা সাজেন্ট পরিকল্পনাকে মেনে নেয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৯৮৫ সালের মধ্যেও সংবিধানের ৪৫নং ধারাটি কার্যকরী হয়নি। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির ডকুমেন্টে তা স্বীকার করে গুণগতমান বজায় রেখে প্রাথমিক শিক্ষার

Scanned with CamScanner

Universal Access, Universal Enrolment এবং Universal Retention-এর নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালে জাতীয় শিক্ষানীতির একটি খসড়া প্রতিবেদনে কমন স্কুল সিস্টেমের মাধ্যমে গুণগতমানে উন্নত প্রারম্ভিক শিক্ষার (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) কথা বলা হয়েছে। সমস্ত বিদ্যালয়ে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং অভিন্ন নিয়ম ও বেতনের সুপারিশ করা হয়। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে (Neighbourhood School) সমস্ত শিশুকে ভর্তি করা হবে। এর মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতি গঠন এবং সমাজের সকল অংশের মানুষের চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটানো হবে। ঐ প্রতিবেদনে আরো বলা হয় সরকার প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জাতীয় শিক্ষা নীতির প্রয়োগের দিকটা বিবেচনা করে পুনরায় জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করবে। যদিও ১৯৮৬ সালের পর আর কোনো জাতীয় শিক্ষানীতি নেওয়া হয়নি।

তৃতীয় পর্যায় : *আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনা*

সব শিশুকে বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তি এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নকে জাতীয় শিক্ষার নীতি হিসেবে ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ১৯৫১ সালের চাইতে ১৯৯১ সালে বেড়ে যায়। দেখা যায় সমগ্র বিশ্বে নিরক্ষরের এক তৃতীয়াংশ হল ভারতীয়। ১৯৯০ সালে 'সকলের জন্য শিক্ষা' শিরোনামে তাইল্যাণ্ডে জম্‌তেইন শহরে আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে ভারতসহ ১৫০টি দেশ অংশগ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত হয় একবিংশ শতকে পদার্পণে নিরক্ষরমুক্ত বিশ্ব গড়া হবে। আর নিরক্ষরতার উৎসমুখ বন্ধ করতে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা শুধুমাত্র দেশের শিশু মৃত্যুহার, সন্তান প্রসবকালীন মায়েদের মৃত্যুহার কমায় না সেই সাথে গড় আয়ুষ্কাল ও জিডিপি বাড়ায় এবং সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে। ১৯৯২ সালে শিশুর অধিকার সম্পর্কিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কনভেনশনে ভারত স্বাক্ষর রাষ্ট্র হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে আইনটি পুনর্বিবেচনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কনভেনশনের ২৮নং নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়—

"State parties recognize the right of the child to education and with a view to achieving this right progressively, they shall in particular (a) make primary education compulsory and available free to all...." সুতরাং শিশুর শিক্ষার অধিকার আইন প্রণয়নেও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে।

চতুর্থ পর্যায় : ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনী আইন ২০০২

১৯৯৩ সালের (J.P. Unnikrishnan versus State of Andhra Pradesh) জে.

Scanned with CamScanner

পি. উন্নিকৃষ্ণান বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের মামলায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের একটি ঐতিহাসিক বিচারে বলা হয় যে, সংবিধানের ২১নং অনুচ্ছেদে বাঁচার অর্থাৎ জীবনের অধিকারের অনুকরণে শিক্ষা হবে মৌলিক অধিকার। এই বিষয়টি ১৯৯৬ সালে দেবগৌড়ার নেতৃত্বে ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার গঠন হওয়ার পর গুরুত্ব পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইউনাইটেড ফ্রন্ট তখন সিপিআই(এম) সহ অন্যান্য বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি নিয়ে গঠিত হয়। এই ফ্রন্টের ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের আওতায় নিয়ে আসা। স্বাভাবিকভাবে বাইরে থেকে জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থন পাওয়া দেবগৌড়া সরকার শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিতে চায়। সরকারের এই প্রস্তাবটি বিবেচনা করার জন্য সইকিয়া কমিটি গঠিত হয়। ১৯৯৭ সালে এই কমিটি সুপারিশ করে যে, ১৪ বছর পর্যন্ত শিশুর অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক অধিকারের জন্য সংবিধান সংশোধন করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে অভিবাবকের মৌলিক কর্তব্যের বিষটিও বিবেচনা রাখা হয়। এরপর ঐ বছরই জুলাই মাসে পার্লামেন্টে ৮৩ তম সংবিধান সংশোধনী বিল আনা হয়। বিলটিতে শিশুর শিক্ষাকে সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির ৪৫নং ধারা থেকে সরিয়ে মৌলিক অধিকারের ২১(A) ধারায় যুক্ত করা হয়। আর অভিভাবকের কর্তব্যসমূহ সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের ৫১ (A)(K) ধারায় যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। বিলটিতে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর শিক্ষাকে ফ্রি ও কম্পালসারি করার কথা আছে এবং বলা হয রাষ্ট্র এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করবে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে, ৬ বছরের কম বয়সের শিশুদের কি হবে? কারণ ৪৫ নং ধারায় ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কথা ছিল। আর ঐ বছরেই পার্লামেন্টারী স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্টে বলা হয় ৬ বছরের কম বয়সের শিশুরা ৪৫নং ধারায় থেকে যাবে। আর আর্থিক ব্যয়ভার বন্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারের যৌথ দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলা হয়। এরপর বিলটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি করে ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার বিলটি পার্লামেন্টে আলোচনা ও বিতর্কের জন্য পেশ করেছিল। কিন্তু তা ঐ সময়ে বাস্তব রূপ পায়নি। কারণ, ১৯৯৮ সালে ইউনাইটেড সরকার ভেঙে যায় এবং ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যালায়েন্স সরকার গঠিত হয়। এরপর ২০০১ সালে পূর্ববর্তী সরকারের আমলে গঠিত বিলটি সংশোধন করা হয় এবং সেটি ঐ বছরেই ২৭শে নভেম্বর আলোচিত হওয়ার পর গৃহীত হয়। সংবিধান সংশোধনের নিয়ম অনুযায়ী এরপর ২০০২ সালের ১৪ মে রাজ্যসভায় বিলটি আলোচিত হয় এবং পুনরায় লোকসভায় পাঠানো হয়। সর্বশেষে বিলটি পুনরায়

Scanned with CamScanner

(৯৩তম সংশোধনী বিল হিসেবে) লোকসভায় পেশ হয় এবং তা গৃহীত হয়। রাষ্ট্রপতি এটি গ্রহণ করার পর ৮৬তম সংবিধান সংশোধনী আইন হিসেবে স্বীকৃতি পায়। শিক্ষা মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য হওয়ায় এর আইনত গুরুত্ব বেড়ে যায়। কারণ পূর্বে এটা নির্দেশাত্মক নীতির অন্তর্ভুক্ত থাকায় এটি আদালতে বলবৎযোগ্য ছিল না। কিন্তু এখন এটি আদালতে বলবৎযোগ্য হয়ে উঠল। অবশ্য এটা বলার অপেক্ষা রাখে না শিশুর শিক্ষাকে সংবিধানের ৪৫নং ধারা থেকে কেবমলমাত্র ২১A ধারায় সরিয়ে আনতে সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পর অর্ধশতক লেগে গেল। এর আবার আইন তৈরি হবে। এবং তার জন্য লাগল আরো আট বছর।

সংবিধানের ৪৫নং ধারায় আগে কি ছিল ও সংশোধনীর পরে যা হয়েছে সেটি এবং ২১A ও ৫১A(K) ধারাটি নীচে ছকে দেওয়া হল—

ধারা	বিষয়বস্তু
	৮৬তম সংশোধনীর পূর্বে যা ছিল
৪৫নং ধারা	সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পরবর্তী ১০ বছর সময়সীমার মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুর শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হবে।
	৮৬তম সংবিধান সংশোধনীর পর যা হয়েছে
৪৫নং ধারা	৬ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুর শৈশবকালীন পরিচর্যা এবং শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ।
২১(A) ধারা	৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সকল শিশুদের শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক আইন প্রণয়ন।
৫১(A)(K) ধারা	পিতামাতা বা অভিভাবক ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবে।

পঞ্চম অধ্যায় : *শিক্ষার অধিকারের আইনি রূপ*

উপরিউল্লিখিত ধারাগুলির ভিত্তিতে ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে 'The Free and Compulsory Education for children Bill 2003' শিরোনামে খসড়া আইনটি তৈরি করা হয়। মডেল বিলটি Ministry of Law বিভাগে পাঠানো হয়। আর জনসাধারণের সুপারিশ পাওয়ার জন্য এই খসড়া আইনটি সরকারী ওয়েবসাইটে (htt://education.nic.in) দেওয়া হয়। জনসাধারণের মন্তব্য ও সুপারিশ পাওয়ার পর এটা পুনর্বিবেচনা করা হয়। পুনর্বিবেচিত আইনটির শিরোনাম ছিল The Free

Scanned with CamScanner

and Compulsoty Education Bill 2004. কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ খসড়া আইনটি তৈরির পর তা ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। মন্ত্রীসভার জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদের কাছে পাঠানো এই কমিটির চেয়ারপার্সন ছিলেন শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধী। জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদ প্রধানমন্ত্রীর মতামত জানতে চান। আর্থিক সংকুলানের অভাবের অজুহাতে বিষয়টি ২০০৬ সালের জুলাই মাসে বাতিল হয় এবং একটি মডেল বিল তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। শেষ পর্যন্ত ২০০৯-এর ত্রয়োদশ লোকসভা ভোটের আগে আইনটি তৈরির উদ্দেশ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর খসড়া আইনটি আইন বিভাগের এবং অর্থদপ্তরের অনুমোদনের জন্য অর্থদপ্তরের নিকট পাঠায়। অবশেষে ২০০৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করা হয়। এদের অনুমোদনের পর ২০০৯ সালের ২ জুলাই পুনর্বিবেবিচত বিলটি ক্যাবিনেটে পাশ হয়। ২১শে জুলাই সংসদের উচ্চকক্ষে অর্থাৎ রাজ্যসভায় এটি পাশ হয় এবং ৫ই আগষ্ট লোকসভায় গৃহীত হয়। ২৬শে আগস্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর ২৭ তারিখে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে 'দ্য গেজেট অব ইন্ডিয়া'তে তা প্রকাশিত হয়। এখন থেকে ভারতবর্ষ শিক্ষার মৌলিক অধিকারের ১৩৫ তম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জম্মু ও কাশ্মীর বাদে দেশের সর্বত্র ১লা এপ্রিল ২০১০ থেকে আইনটি কার্যকরী হয়।

আইনটির বিবরণ ও ভবিষ্যৎ :

বিনা ব্যয়ে শিশুর শিক্ষার অধিকার আইনটির মোট সাতটি অধ্যায় এবং শেষে একটি তফসিল আছে। প্রথম অধ্যায়ের আইনটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দগুলির অর্থ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিশুর অধিকার, তৃতীয় অধ্যায়ে কেন্দ্র, রাজ্য, স্থানীয় প্রশাসন এবং অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের ভূমিকা, পঞ্চম অধ্যায়ে প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণকরণ ও পাঠ্যক্রমের বিবরণ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে শিশুর অধিকারের রক্ষাকবচ এবং সপ্তম অধ্যায়ে বিবিধ বিষয়গুলি উল্লেখ আছে। আইনটিতে মোট ৩৮ টি অনুচ্ছেদ আছে।

শিশুর অধিকার কি?

আইন অনুসারে বিনা ব্যয়ে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ছেলেমেয়ে যে কেউ তার বাড়ির নিকটবর্তী (Neighbourhood) বিদ্যালয় থেকে প্রারম্ভিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারবে। নিকটবর্তী বিদ্যালয় কোন্‌টি হবে তা নির্ধারণ করবে রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ২০১০-এর ৪ঠা মার্চ বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিকটবর্তী বিদ্যালয়ের সীমানা নির্ধারণ করে। গ্রাম এলাকায় নিম্ন প্রাথমিকের

Scanned with CamScanner

(চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত) জন্য ১ কিলোমিটার এবং শহরের ৫০০ মিটারের মধ্যে বিদ্যালয় হওয়া চাই। উচ্চপ্রাথমিকের জন্য (পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) গ্রাম এলাকায় ২ কিলোমিটারের মধ্যে এবং শহর এলাকায় ১ কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যালয়কে নিকটবর্তী বিদ্যালয় বলে গণ্য করা হবে। কোনো শিশু এমন বেতন বা বিদ্যালয়ের অন্যান্য খরচ বহন করতে বাধ্য থাকবে না (যাতে সে প্রারম্ভিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে অক্ষম হবে)। বিদ্যালয়ের বেতন শিক্ষার খরচের একটি অংশ। অন্যান্য খরচ বলতে পাঠ্যপুস্তক, খাতা, পেন্সিল, কলম, পোশাক ও যাতায়াতের খরচ বোঝায়। প্রতিবন্ধী শিশুরাও বিনা ব্যয়ে শিক্ষার অধিকার লাভ করতে পারবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে শ্রবণযন্ত্র, চশমা, ব্রেইল বই, ক্র্যাচ, হুইল চেয়ার ইত্যাদি অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে বাবা-মা বা অভিভাবক সন্তানের শিক্ষার খরচ যোগাড় করতে না পারার জন্য যেন কেউ মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে না দেয়। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে আর্থিক বাধা আসলে রাষ্ট্র তা বহন করবে। যদি কোনো শিশুর বয়স ৬ বছরের বেশি হয় এবং সে যদি বিদ্যালয়ে কোনো সময় ভর্তি না হয়ে থাকে অথবা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারেনি তাহলে সে তার বয়সের উপযোগী শ্রেণীতেই ভর্তি হওয়ার অধিকার পাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় হোসনেয়ারার বয়স ১৩ বছর। সে কোনোদিন বিদ্যালয় ভর্তি হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী ১৩ বছর বয়সের শিশুরা সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। অতএব হোসনেয়ারা সপ্তম শ্রেণীতেই ভর্তি হবে। আবার সম্রাটের বয়স ১১ বছর। সে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু সে প্রারম্ভিক শিক্ষা সমাপ্ত করবার পূর্বে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ সমাপ্ত করে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। সম্রাট ভর্তি হবে পঞ্চম শ্রেণীতে। এক্ষেত্রে হোসনেয়ারা এবং সম্রাট উভয়কেই বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যাতে উভয়ই তাদের শ্রেণীর উপযোগী মানের শিক্ষা পায় তারজন্য তিন মাস থেকে দুবছরের জন্য তারপ্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। এখন সাধারণভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, হোসনেয়ারাকে কি দুবছরের মধ্যে সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী করে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব? এম. ভি. ফাউণ্ডেশনের মতো সংস্থা এই বিষয়ে গবেষণা করে মন্তব্য করেছে যে-হ্যাঁ, তা সম্ভব। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে নমনীয়তাও থাকবে। যেমন যদি দেখা যায় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে কাঙ্ক্ষিত মানে অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীর মানে উন্নীত করা যায়নি, শিক্ষক বা শিক্ষিকা মনে করছেন শিক্ষার্থীকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করলেই সে ভালো ফল করবে সেক্ষেত্রে বিষয়টি শিক্ষার্থীর বাবা-মাকে বোঝানো যেতে পারে। প্রয়োজনে হোসনেয়ারা বা সম্রাটের বা অন্য কারো ক্ষেত্রে ১৪ বছর পার হয়ে গেলেও তাদের অষ্টম শ্রেণীতেই পড়ার অধিকার থাকবে।

Scanned with CamScanner

আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বেশিরভাগই প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। এখন যদি কোনো শিশু চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করে তাহলে সেকি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে? হ্যাঁ, এক্ষেত্রে সে কোনো পরীক্ষা ছাড়াই সরকারী বা সরকার নিয়ন্ত্রিত নিকটবর্তী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। এই বিষয়টি ৫(১) নং ধারায় উল্লেখ আছে। আবার যদি কোনো শিশু একটি বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে বদলি হতে চায় তাহলে অবশ্যই প্রধান শিক্ষক তাকে বদলির জন্য ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য থাকবেন। কোনো বিদ্যালয় ট্রান্সফার সার্টিফিকেট না থাকার অজুহাতে ভর্তি অস্বীকার করতে পারবে না। প্রধান শিক্ষক ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিতে দেরী করলে আইনের ৫(৩) ধারা অনুযায়ী তাঁকে শাস্তি পেতে হবে।

বয়সের শংসাপত্র কি ভর্তির ক্ষেত্রে বাধা হবে?

না। বয়সের কোনো সার্টিফিকেট না থাকলেও শিশুকে বাবা-মায়ের দাবির বয়স অনুযায়ী বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো যাবে তবে জন্ম শংসাপত্র (Birth Certificate) সংগ্রহ করতে হবে। কারো জন্ম শংসাপত্র না থাকলে পিতা-মাতা বা অভিভাবক হলফনামা জমা দেবেন। অথবা হাসপাতাল বা এ.এন.এম. রেকর্ড বা অঙ্গনওয়াড়ি রেকর্ডের ভিত্তিতে শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর সুযোগ থাকবে।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এককথায় বলা যায়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভেদে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সমস্ত শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি, ট্রান্সফার এবং প্রারম্ভিক শিক্ষা সমাপ্ত করার অধিকার থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন হল সব ধরনের বিদ্যালয়ে কি পড়ার অধিকার থাকবে? না। আইনে চার ধরণের বিদ্যালয়ের মধ্যে কেবল সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে কেবলমাত্র ভর্তির অধিকার থাকবে। শুধুমাত্র বেসরকারী নয় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন মডেল স্কুল, নবোদয় বিদ্যালয়, সৈনিক বিদ্যালয় বা ঐ ধরনের বিশেষ বিদ্যালয়ে সব শিশুর ভর্তির অধিকার থাকবে না। তবে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির ২৫ শতাংশ দরিদ্র বা পিছিয়ে পড়া অংশ থেকে শিক্ষার্থী গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। বাস্তবে এটা কতটা কার্যকরী হবে তা সন্দেহ থেকে যায়। আইনে গুণগত মানে উন্নত শিক্ষা পাওয়ার অধিকারের কথা আছে। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়ে শিক্ষার বৈষম্যকে আইনত স্বীকৃতি, বৈধতা দেওয়া হল এই আইনেই। কিছু শিক্ষার্থীর জন্য গুণগত মানে উন্নত, উন্নত পরিকাঠামো রেখে মডেল স্কুল হল আর সাধারণের জন্য দুইজন শিক্ষকের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ও রইল। শিক্ষাকর্মীও নেই। দুই শিক্ষক পাঁচটি শ্রেণীর ক্লাস কিভাবে পরিচালনা

Scanned with CamScanner

করবে? সব শিক্ষক কি মধুসূদন না কি একসাথে অনেক ধরনের কাজ করবেন। একসাথে একাধিক ক্লাস, ড্রপ-আউট ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ক্লাশ নিতে হবে, আবার বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। শৌচালয় পরিষ্কার থেকে মিড-ডে মিলের ব্যবস্থাও করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব

আইনে যৌথ দায়িত্বের কথা বলা আছে। দায়িত্বগুলি কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মিলেমিশে করবে। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়গুলির এবং বিধানসভাহীন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিদ্যালয়ের কর্মনীতি নির্ধারণ, পাঠ্যক্রম স্থির করা, শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের ট্রান্সফার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্র সরকার। আবার ঐ সকল বিদ্যালয়ের আর্থিক দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের। এছাড়া, সমগ্র দেশে এই আইনটি কার্যকরী করার জন্য মূলধন এবং পৌনঃপুনিক হিসাব রাখবে কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে গ্রান্ট-ইন-এইড দেবে। শিক্ষাখাতে রাজ্যগুলির কত পরিমাণ অর্থ দরকার তা ইচ্ছে করলে কেন্দ্র পরীক্ষা করে দেখবে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির শিক্ষা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে একটি জাতীয় পাঠ্যসূচি তৈরির চেষ্টা করবে।

রাজ্য সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

রাজ্য সরকার ২০১০-এর ১লা এপ্রিলের পর থেকে তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০১৩-এর ৩১শে মার্চের মধ্যে যেখানে যেখানে বিদ্যালয় প্রয়োজন সেখানে বিদ্যালয় স্থাপন করবে। কেন্দ্রীয় সাহায্যকৃত অর্থ ছাড়া প্রয়োজনীয় অর্থ রাজ্য সরকার সংগ্রহ করবে। নিকটবর্তী বিদ্যালয় বলতে কোন বিদ্যালয়কে বোঝানো হবে তা রাজ্য সরকার ঠিক করবে। স্কুল বিল্ডিং, স্কুল ম্যাপ তৈরি, শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের উপযুক্ত স্থানে ট্রান্সফার এবং শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। প্রতিবন্ধী শিশুরা যাতে সহজে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। এছাড়া শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত স্থির করা ও সেই অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন, NCTE এর নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, জাতীয় স্তরের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠক্রম তৈরি, পঠন পাঠনের মান বজায় রাখা, বাৎসরিক সূচি তৈরি করা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট কর্মসূচিগুলি রূপায়নে সহায়তা করবে। এছাড়া নিজস্ব এলাকায় শিশুদের গণনা করা, তাদের ভর্তি ও দৈনিক উপস্থিতি

Scanned with CamScanner

সুনিশ্চিত করা, সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনিচ্ছুক বাবা-মাকে বোঝানো ইত্যাদি কাজগুলি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পালন করবে।

পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই আইনের ১০নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিদ্যালয়ে শিশুকে ভর্তি করা প্রতিটি অভিভাবকের কর্তব্য। কিন্তু প্রশ্ন হল কোনো পিতা বা মাতা যদি তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠান তাহলে কি সেই পিতা-মাতার শাস্তি হবে? না। শাস্তি হবে না। কারণ ভারতের ন্যায় দেশে দরিদ্র পিতামাতার অভাব নেই। সেক্ষেত্রে তাদের শাস্তি দিয়ে জেলে পাঠালে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ার পরিবর্তে জেলে পিতামাতার সংখ্যাই বাড়তে থাকবে। দরিদ্র পিতামাতাকে শাস্তি দেওয়ার অর্থ হল দরিদ্র বা গরীব বলে তাদের শাস্তি পেতে হল। শিশু শ্রমিক বা পথ শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব সরকারের। প্রয়োজনে তাদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো জনগোষ্ঠীর প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অল্প বয়সে বিবাহ হলে তাদেরকে বোঝাতে হবে এবং প্রয়োজনে বাল্যবিবাহের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকার কর্তব্য ও দায়িত্ব

দেশে শিক্ষা বিষয়ক যে আইনই হোক না কেন, তা কার্যকরী করতে হলে শিক্ষকের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আজ রাষ্ট্রব্যবস্থার নীচুতলা থেকে উপরতলা পর্যন্ত অনেকাংশে কলুষিত। শিক্ষক সমাজ কিন্তু চিরকালই নিজেকে সংযত রাখতে সমর্থ। যদিও ভোগবাদী দর্শনের প্রভাবে আমরা হয়তো বা কেউ কেউ আক্রান্ত হচ্ছি। বাধ্যবাধকতায় কোচিং সেন্টারের রমরমা ব্যবসায়ের সাথে নিজেকে যুক্ত করছি। প্রাইভেট মালিকদের প্রতি সরকারী অতি উৎসাহী পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতে শিক্ষকদের কেউ কেউ আদর্শ শিক্ষক হওয়ার চাইতে আর্থিক কারণে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয়ে প্রাইভেট টিউশন বাজারে নেমে পড়েছি। তাসত্ত্বেও বেশিরভাগ শিক্ষকই তাঁদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হননি। সেইজন্যই তো আজও ক্লাসের পিছনের বেঞ্চের ছাত্রটিও রাস্তায় দেখা হলে দৌড়ে এসে পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে। যাইহোক, শিক্ষকের কর্তব্য থেকে শিক্ষকদের কখনও বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। সাধারণভাবে পাঠক্রিয়া পরিচালনা, শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, বিদ্যালয় পরিচালনা এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ গঠনের ভূমিকা পালন করে থাকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এককথায় শিক্ষক হলেন জ্যোতিষ্ক। শিক্ষকের উজ্জ্বল মর্যাদা, সম্মান বজায় রেখে বিনা ব্যয়ে শিশুর শিক্ষার অধিকার সম্পর্কিত আইনটির চতুর্থ অধ্যায়ে বিদ্যালয়ের কর্তব্য,

Scanned with CamScanner

বিদ্যালয়ের গুণগতমান ইত্যাদির সঙ্গে শিক্ষকের যোগ্যতা, কাজ এবং প্রাইভেট টিউশন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়গুলি ১২ থেকে ২৮ ধারায় উল্লেখ আছে। আইন অনুযায়ী পাঠ্যক্রম পরিচালনা ও (নির্দিষ্ট সময়ের) মধ্যে তা সমাপ্ত করা, প্রতিটি শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা ও তাকে সাহায্য করা, বাবা-মা এবং অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত মিটিং করা এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, শিক্ষার অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে অভিভাবকদের অবহিত করা। কোনো শিক্ষক দশ বছর অন্তর জনগণনার কাজ, বিপর্যয় মোকাবিলার দায়িত্ব, সংসদ, বিধানসভা অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব ছাড়া অন্যান্য শিক্ষা বহির্ভূত কাজে নিযুক্ত থাকবে না। শিক্ষকরা বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি গঠন করতে সাহায্য করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষার্থীর মা-বাবা বা অভিভাবক এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে পরিচালন সমিতি গঠন করা হবে। কমিটিতে অভিভাবক প্রতিনিধির সংখ্যা সর্বাধিক রাখার কথা বলা হয়েছে। কমিটির মোট সদস্যের মধ্যে ৩/৪ ভাগ অভিভাবক প্রতিনিধি থাকবেন। এদের মধ্যে আনুপাতিক হারে যাতে সমাজের দুর্বলতর অংশের মধ্যে থেকে আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আবার মোট সদস্যের অর্ধেক যাতে মহিলা হন সেদিকটাও দেখতে হবে। তবে কিভাবে নির্বাচিত হবেন তা রাজ্য সরকার ঠিক করবেন। বলা বাহুল্য আইনে যেভাবে বিদ্যালয়ের বাইরের ব্যক্তিকে বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে আসার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে তাতে আগামী দিনে অ্যাকাডেমিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের চাইতে বাইরের প্রতিনিধিদের গুরুত্ব বেড়ে যেতে পারে। এতে বিদ্যালয়গুলি শাসকগোষ্ঠীর তাঁবেদার হতে পারে অথবা বিরোধ হতে পারে। তার ফলে বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান বজায় রাখা বা উন্নত হওয়াটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করা যায়। শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচালন সমিতির অন্যান্য সদস্যদের বিরোধে বিদ্যালয়ের পরিবেশ কলুষিত হতে পারে।

প্রারম্ভিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম

২০০৯-এর শিক্ষা আইনের ২৯নং ধারায় পাঠ্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠ্যক্রম তৈরির সময় সংবিধানে উল্লিখিত মূল্যবোধগুলি বিবেচিত হবে। সেই সাথে শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ যাতে চরম মানে উন্নীত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে পাঠ্যক্রম গড়ে তুলতে হবে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যসূচি পুনঃসংগঠিত করতেও পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে।

Scanned with CamScanner

পর্যালোচনা ও অভিমত

মাননীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী কপিল সিব্বাল (২০১২) এই আইনকে বিশ্বের একটি মডেল হিসবে আখ্যা দিয়েছেন। সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী মনমোহন সিংহ বলেছে "We are committed to ensuring that all children, irrespective of gender and social category, have access to education. An education that enables them to acquires the skills, knowledge, values, and attitudes necessary to become responsible and active citizen of India" আশা করা হয়েছে আইনটি কার্যকরী করার মধ্য দিয়ে দায়িত্বশীল সক্রিয় নাগরিক গড়ে তোলা হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভেদে সকলকে শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী এই আইনের দশটি নীতির কথা বলেছেন—যথা (১) অবৈতনিক শিক্ষা (২) বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা (৩) সংবিধানে উল্লিখিত মূল্যবোধগুলি পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা (৪) শিক্ষকদের গুণগত মান নিশ্চিত করা (৫)বিদ্যালয়ের নর্ম সুনির্দিষ্ট করা (৬) সামাজিক উন্নয়নে প্রেরণা দান করা (৭) শিশুকে রক্ষা করা (৮) খুবই সহজ নিয়মে পরিচালনা করা (৯) জনসাধারণের নিকট ক্ষমতা রাখা এবং (১০) পরীক্ষার চাপ থেকে মুক্ত করা। কিন্তু এই আইন সত্ত্বেও সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা পূর্ণ করতে সক্ষম হবে কি? এই প্রসঙ্গে কতকগুলি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে ওঠে । এই আইনটির বাস্তব রূপ দেবে কারা? কেন্দ্র বা রাজ্য প্রশাসন এবং তার আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা? সমালোচিত হয় এভাবে যে, যাঁরা স্বাধীনতার পর নিরক্ষর জনসংখ্যা বাড়িয়েছে তারাই এটা প্রয়োগ করবে? আইনটি সঠিকভাবে কার্যকরী করার জন্য কোনো সুসংগঠিত সংস্থা বা ব্যবস্থার কথা আইনটিতে নেই। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন আইনটি প্রারম্ভিক শিক্ষার গুণগত মানের বৈষম্যের ফারাক প্রসারিত করবে। আইনটি উল্লিখিত চার ধরনের বিদ্যালয়ের মধ্যে গুণগত মানে উন্নত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, ন্যূনতম যে পরিকাঠামোর কথা বলা হয়েছে তার চাইতে নবোদয় বিদ্যালয় বা বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো অনেক উন্নত। তাছাড়া সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে যে ন্যূনতম পরিকাঠামোর কথা বলা হয়েছে সেটুকুও অনেক বিদ্যালয়েই নেই। উদাহরণ স্বরূপ কেবলমাত্র শিক্ষকের কথাই ধরা যাক। মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী নিজেই বলেছেন সমগ্র দেশে প্রায় পাঁচ লক্ষ শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষক পদ তৈরি দূরে থাকুক শূন্য পদগুলি পূরণের অনেক দীর্ঘ সময় লাগে। আবার নতুন শিক্ষক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে আবার একদল শিক্ষকদের অবসরের বয়স হয়ে যায়। ফলে বিদ্যালয়গুলিতে সব সময় শিক্ষক পদ খালি থেকে যায়। সাময়িক সময়ের জন্য সরাসরি বিদ্যালয়গুলি শিক্ষক নিয়োগ করতে পারবে না। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়

Scanned with CamScanner

পরিচালন সমিতি বা প্রধান শিক্ষক নিজেরা অর্থ সংগ্রহ করার সুযোগও অনেকটা হারাবে। আইনেই ১৩নং ধারাতে বলা হয়েছে বিদ্যালয় ক্যাপিটেশন ফি নিতে পারবে না। বিষয়টা সাধারণভাবে খুবই ভালো বলে মনে হলেও সরকারী বিদ্যালয়ের আয় বাড়ানো সুযোগ কিন্তু আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হল। অথচ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে ঐ ধরনের কোনো নিয়ম রইল না। কেউ কেউ মনে করেন এই আইনটি পরোক্ষাভাবে পিছনের দরজা দিয়ে শিক্ষায় বেসরকারীকরণকে অর্থাৎ ব্যবসায়িক উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে। সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে NCTE-এর নিয়মের বাইরে প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে না। সাধারণাভাবে মনে হতে পারে ভালোই তো, বিদ্যালয়গুলি যোগ্য শিক্ষক পাবে, শিক্ষার গুণগত মান বাড়বে। বাস্তবে কিন্তু তা হওয়া শক্ত। বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক তৈরির দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে সরকার বেসকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করে শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ অনুমোদন করছে। সমাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের চাহিদা তৈরি করে বেসরকারী কলেজগুলিকে ফুডিং করছে।

আইনটি কার্যকরী করার জন্য যে খরচ হবে তা কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারই বহন করবে। আর্থিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রও রাজ্যের অনুপাত ৫৫ঃ৪৫। উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির জন্য এই অনুপাত হবে ৯০ঃ১০। কিন্তু কিছু রাজ্য বলেই দিয়েছে কেন্দ্রের সাহায্য অর্থ ছাড়া তারা এই আইনটি কার্যকরী করতে পারবে না। NUEPA হিসেব করে দেখেছে এই আইনটি কার্যকরী করতে সরকারের বাড়তি খরচ হবে পাঁচ বছরে ১ লক্ষ ৭১ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতি বছর প্রায় ৩৪ হাজার কোটি টাকা বাড়তি খরচ হবে। কিন্তু দেখা যায় ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে বরাদ্দ হয়েছিল ২১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। পরের বছর ২০১০-১১তে ২৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল এর মধ্যে ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা মিড-ডে মিলের জন্য। সুতরাং আইন করার পরে যে বাড়তি অর্থ বরাদ্দ করার কথা তা কোথায়? অর্থাৎ আর্থিক কারণে আইনটি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে বাধা আসছে।

সর্বোপরি, আইনটি কার্যকরী করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পঠন পাঠনের বাইরের কাজগুলি কমানো দরকার। সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জনগণনা, লোকসভা, বিধানসভা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে যুক্ত থাকার কথা আইনে আছে। এতে দৈনন্দিন পঠন পাঠনে অসুবিধাই হয়। কিন্তু বেসরকারী বিদ্যালয়ে তা হবে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পঠন পাঠনের বাইরের কাজগুলি কমানোর জন্য শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা দরকার। আইনে এটিও উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল। আইনটি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে নতুন করে বিদ্যালয় তৈরির আর্থিক অপ্রতুলতার কথা বিবেচনা

করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও
প্রাথমিক স্তরের ক্লাস চালু করা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসগুলি সকাল আটটার পর শুরু করা যেতে পারে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোকে ব্যবহারের করে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করলে শিক্ষার গুণগত মানও বাড়তে পারে। আবার পরিকাঠামো তৈরির খরচও কমে যাবে। সর্বশেষে এটা বলা যেতে পারে শুধুমাত্র আইন তৈরি করে নয় সর্বজনীন শিক্ষার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ প্রয়োজন। যাঁরা আইনকে বাস্তবায়িক করবেন তাঁদের আন্তরিকতা এবং দৃঢ়তার প্রয়োজন। সরকারী বা সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি সরাসরি পরিচালনা করে থাকে সরকারী আমলা, আধিকারিক ও কর্মচারীরা। কিন্তু তারা এই বিদ্যালয়গুলির গুণগত মান উন্নত করতে পারেনি। সেইজন্য তাঁদের নিজেদের সন্তান সন্ততিকে তারা বেসরকারী বিদ্যালয়ে পাঠায়। এমনকি সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারাও তাদের পুত্রকন্যাদের নিজেদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন না। সুতরাং আমাদের আইনের সাথে প্রয়োজন সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সর্বোপরি, রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

তথ্যসূত্র :

১। Agarwal, J.C. (not mentioned). Education Policy in India, Delhi, Shirpa Publications

২। Ghosh, S.C.- (2010), The History of education in Modern India, New Delhi, Orient Blackswan Private Limited

৩। Naik, J.P.(1997), The Education Commission and after. New Delhi, A.P.H., Publishing Corporation

৪। Ramdas, B. (2013), the Right to Education Act - Opening the Back-door to Privatization of Education. India Education Review, Retrieved from www, indiaeducation.com

৫। The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, The Gazette of India, 26th August, 2009

৬। Uma (2013) Right to education : A Critical Appraisal., In 10 SR Journal of Humanities and Social Science, Volume 6, Issue 4 Retrieved from 10 srjournals.org

Scanned with CamScanner